শখ, জীবনরক্ষা, শারীরিক সক্ষমতা, সফলতা সবকিছু একসাথে

লেখক: ডা. মোহসিনা বিনতে শরীফ | প্রকাশিত: 15 August 2026, 11:54 AM | বিভাগ: ফিচার

লেখার শিরোনাম দেখে অনেকেরই ভ্রু-কুঁচকে যেতে পারে। অনেকেই ভাবতে পারেন একের ভেতর অনেক কিছু এটাও কী সম্ভব? সম্ভব। বিস্তারিত ব্যাখ্যা করার আগে আমার জীবনে ঘটে যাওয়া দু’একটি বিষয় নিয়ে একটু আলোকপাত করতে চাই। ১৯৮৭ সালে লিবিয়া থেকে ঢাকায় ফেরার পর আমরা সদরঘাট হয়ে লঞ্চে চড়ে যাচ্ছিলাম আমাদের দাদাবাড়ি, ঢাকা জেলার অন্তর্গত নবাবগঞ্জ উপজেলার-আলগীচর গ্রামে। বাঘমারা পৌঁছানোর পর পরিবারের সবাই সিদ্ধান্ত নিলেন, সোজা বাড়ি না গিয়ে আগে বড় চাচির বাবার বাড়ি কার্তিকপুরে যাওয়া হবে। ফলে আমরা কেউ লঞ্চ থেকে নামলাম না। তার ওপর চাচাতো ভাইবোনেরা লঞ্চে উঠে পড়ায়, চার বছরের আমার আনন্দ যেন আর ধরে না।

বাঘমারা ঘাট থেকে মাত্র ত্রিশ মিনিটের মধ্যেই আমরা কার্তিকপুরে পৌঁছে গেলাম। শীতকাল হওয়ায় নদীতে পানি কম থাকায় লঞ্চ ঘাট পর্যন্ত ভিড়তে পারেনি। তাই সিদ্ধান্ত হলো, অন্য সবার মতো আমরাও লঞ্চের জানালা দিয়ে খেয়া নৌকায় নেমে খাল পেরিয়ে যাব। আমরা ছিলাম প্রায় ১০-১২ জন, তাই দুটি নৌকা লঞ্চের নিচতলার জানালার কাছে ভিড়ল। আমার মায়ের কোলে ছিল দুই বছরের ছোট বোন। বাবা

প্রথমে আমাকে লঞ্চের জানালা দিয়ে মাঝির সহায়তায় নৌকায় নামিয়ে দিলেন। এরপর মাঝি বাবাকে নামতে সাহায্য করছিলেন, যাতে বাবা ছোট বোনকে কোলে নিতে পারেন এবং মা নিরাপদে নামতে পারেন। ঠিক সেই মুহূর্তে, আমার এক ১০-১২ বছরের চাচাতো ভাই হঠাৎ জানালা দিয়ে লাফিয়ে নৌকায় পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে নৌকাটি উল্টে গেল। বাবা, মাঝি এবং আমি সবাই পানিতে তলিয়ে গেলাম।

সাঁতার না জানার কারণে আমি ধীরে ধীরে ইছামতির গভীরে ডুবে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ পানির নিচ থেকে কারও একটি শক্ত হাত আমাকে টেনে ওপরে তুলে আনল। পানির ওপর মাথা তুলেই দেখলাম, মা হতভম্ব হয়ে পানিতে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, আর বাবা চারদিকে ডুব দিয়ে আমাকে খুঁজছেন। এরপর আর কিছু মনে নেই। সবকিছু কেমন ঝাপসা হয়ে গেল। পরে জ্ঞান ফিরল চাচির বাবার বাড়িতে। বড় হয়ে শুনেছি, আমি নাকি টানা আঠারো ঘণ্টা ঘুমিয়েছিলাম। এরপর বহুবার গ্রামে বেড়াতে গিয়ে পাতিল, প্লাস্টিকের বয়া কিংবা বোতল নিয়ে পুকুরে নেমেছি। কিন্তু প্রকৃত অর্থে সাঁতার শেখা আর হয়ে ওঠেনি।

১৯৯৭ সালের শেষের দিকে, অথবা ১৯৯৮ সালের শুরুতে, আমি তখন এসএসসি পরীক্ষার্থী। ফুফাতো বোনের বিয়েতে আমরা সবাই ফরিদপুরের পূর্বখাবাশপুরে গিয়েছিলাম। বাড়ি ভর্তি আনন্দ আর কোলাহল। হলুদের পরদিন সবাই পদ্মার শাখা কুমার নদীতে গোসল করতে নামলাম। আমরা ছিলাম ৩০-৪০ জন। আমরা তিন বোন কেউ সাঁতার জানতাম না। কোমর সমান পানিতে দাঁড়িয়ে গোসল করছিলাম। হঠাৎ আমি আর আমার ছোট বোন পা পিছলে গভীর পানিতে চলে গেলাম। কোথাও ঠাঁই পাচ্ছিলাম না। বাঁচার জন্য আমরা একে অপরকে আঁকড়ে ধরে হাবুডুবু খেতে লাগলাম। এবারও দেখলাম, মা নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে চিৎকার করছেন এবং পানিতে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। কিন্তু ততক্ষণে স্রোত আমাদের অনেক দূরে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে।

আমি ভেসে থাকার চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু ছোট বোনটি এমনভাবে আমার ঘাড়ে ভর দিচ্ছিল যে আমিও তলিয়ে যাচ্ছিলাম। ঠিক তখনই, আমাদের থেকে মাত্র কয়েক হাত দূরে থাকা আমার মেঝো ফুফুর বড় মেয়ে দেবদূতের মতো এগিয়ে এলেন। তিনি আমাদের দুজনকে টেনে নিরাপদে পাড়ে তুলে আনলেন। দ্বিতীয়বারের মতো ডুবতে ডুবতে আল্লাহর অশেষ রহমতে বেঁচে ফিরলাম। এই দুটি ঘটনা আমার মনে পানির প্রতি এক গভীর ভীতি তৈরি করে দিল। এরপর সবাই পুকুরে, নদীতে সাঁতার কাটলেও, আমি হাঁটু সমান পানিতে দাঁড়িয়েই সন্তুষ্ট থাকতাম।

২০২৩ সালে আমার বড় সন্তান মিরপুর জাতীয় সুইমিং কমপ্লেক্সে সাঁতার শিখতে ভর্তি হলো। কিছুদিনের মধ্যেই সে ওর বোনকেও সাঁতার শেখানোর জন্য উৎসাহিত করল। শুক্র ও শনিবার আমার অফিস ছুটি থাকায়, আমি মেয়েকে নিয়ে যেতাম। প্রথম দিন বসে বসে প্রশিক্ষণ দেখছিলাম। দেখলাম, প্রশিক্ষক অত্যন্ত সহজ, সাবলীল ও আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গিতে ছোট-বড় সবাইকে সাঁতার শেখাচ্ছেন। দ্বিতীয় দিন আর নিজেকে আটকে রাখতে পারলাম না। ১,১০০ টাকায় পুরো সাঁতারের সরঞ্জাম কিনে আমিও নেমে পড়লাম সুইমিং পুলের গলা-সমান পানিতে। আমার মেয়ে মাত্র দুই দিনেই শিখে গেল, কারণ ওর বাবা আগেই ওকে কিছুটা প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। কিন্তু আমার দীর্ঘদিনের পানিভীতি কাটিয়ে সাঁতার শিখতে সময় লাগল নয়

দিন। পঞ্চম দিনে প্রথমবারের মতো পানির নিচে ডুব দেওয়ার সাহস পাই। ছেলের একটি হেলমেট ছিল, যেটি পরে পানির নিচে শ্বাস নিয়ে ভেসে থাকা যেত।

আমাদের প্রশিক্ষক ছিলেন জাতীয় সাঁতারু সোহাগী খাতুন। তাঁর ধৈর্য, দক্ষতা ও আন্তরিকতা আমাকে পানির ভয় জয় করতে সাহায্য করেছে। সোহাগী খাতুন ২০০৭ সালে গ্রামভিত্তিক সাঁতার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সাঁতারের জগতে প্রবেশ করেন। ২০০৯ সালে, জাতীয় সাঁতারু ও স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত কামাল হোসেন এবং লাবনী আখতার জুঁইয়ের হাত ধরে তিনি বাংলাদেশ আনসার বাহিনীতে যোগ দেন। জুনিয়র পর্যায়ে তিনি ৬৫টিরও বেশি পুরস্কার অর্জন করেন। পরবর্তীতে পারিবারিক দায়িত্বের কারণে সিনিয়র সাঁতারু হওয়ার স্বপ্ন বিসর্জন দিয়ে, অসুস্থ মা ও বোনের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন। গত ছয় বছর ধরে তিনি বাংলাদেশ জাতীয় সুইমিং কমপ্লেক্স এবং একটি স্বনামধন্য পাঁচতারা হোটেলে নারী সাঁতার প্রশিক্ষক হিসেবে কর্মরত। বর্তমানে তিনি ১৮ মাস বয়সী এক কন্যাসন্তানের জননী। আমার জীবনে অনেকে শিক্ষক এসেছেন, যাঁদের অবদান অনস্বীকার্য। ২০২৩ সালের জুন থেকে সোহাগী খাতুন শুধু আমার নয়, আমার পরিবার ও বন্ধুদেরও সাঁতার প্রশিক্ষক।

আজ যখন নীল পানিতে ভেসে নীল আকাশে উড়ে যাওয়া পাখিদের দেখি, তখন বারবার মনে পড়ে যায় সেই দুই দিন, যেদিন আমি ডুবে যাচ্ছিলাম। মনে পড়ে মায়ের আতঙ্কিত মুখ। মা ২০১১ সালে আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। তিনি দেখে যেতে পারেননি, তাঁর সেই পানিভীত মেয়ে একদিন সাঁতার শিখে ফেলবে।

আমাদের শহরের অভিভাবকেরা সংসার, কর্মজীবন এবং সন্তানদের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত। আর গ্রামের মায়েরা দিন কাটান গৃহস্থালির নানান কাজে ব্যস্ত থেকে। নদীমাতৃক এই দেশে রোগ-শোকে শিশুমৃত্যুর তুলনায় পানিতে ডুবে শিশু মৃত্যুর হার এখনো উদ্বেগজনকভাবে বেশি। শহরে পুকুর, নদী, খাল-বিলের অভাবে আমার মতো অনেকেই হয়তো চল্লিশের পরে সাঁতার শিখছেন। তবে দেরিতে হলেও শেখা জরুরি। এখন সুযোগ পেলেই আমি শুক্র ও শনিবার অন্তত এক ঘণ্টার জন্য সুইমিং কমপ্লেক্সে যাই। সাঁতার শুধু আমাকে পানিভীতি থেকে মুক্ত করেনি; দীর্ঘদিনের অ্যাজমা এবং করোনার পরবর্তী হাত-পায়ের ব্যথাও অনেকটাই উপশম করেছে। সত্যিই, সাঁতার আমার জীবনে এক নতুন মুক্তির নাম।

এতক্ষণ যা কিছু লিখলাম সেখানে আমার আবেগ জড়িয়ে আছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো সাঁতার শুধু আবেগের জায়গা নয়। শুধু শখ হিসেবে দেখলেও ভুল হবে। এটি উচ্চমানের ব্যায়াম। শরীরচর্চা দেহমনকে প্রফুল্ল রাখে। আপনি পেশাজীবনে যখন যা কিছুই করুন না কেন আপনার শারীরিক ফিটনেস অনবদ্য ভূমিকা রাখে। চাকরি, ব্যবসা যা-ই করুন শারীরিক ফিটনেস প্রয়োজন। বাংলায় একটি কথা আছে, গাইতে গাইতে গায়েন। কথাটি অমূলক নয়। সাঁতার শিখতে শিখতে কারও মনে যে প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার ইচ্ছা জাগ্রত হবে না তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। কেউ যদি নিয়মিত চর্চা করে তাহলে তার আত্মবিশ্বাস বেড়ে যাবে। এই আত্মবিশ্বাসই এক সময় তাঁকে প্রতিযোগিতার মঞ্চে নিয়ে যাবে। আর কর্পোরেট জগতে

আপনাকে প্রতিনিয়ত দৌঁড়াতে হবে। সেই দৌঁড়ে টিকে থাকার জন্য আপনার প্রফুল্ল মন ও শারীরিক যোগ্যতা অন্যান্য যোগ্যতার সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে আপনাকে আরও গতিশীল হতে সহায়তা করবে। আপনাকে এগিয়ে দেবে লক্ষ্যের দিকে।

© 2026 আপনার নিউজ পোর্টাল। সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।
এই প্রতিবেদনটি আমাদের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা হয়েছে।